সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ

অধ্যাপক শফি আহমেদ, ইংরেজি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (২৩ জুন, ২০১০)

- এমন একটা আলোচনা সভার আয়োজন থেকেই বোঝা যায় যে, বর্তমানে সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষাদান বা গ্রহণের সুস্থ পরিবেশ বিষয়ে জনমনে সংশয় দেখা দিয়েছে। শুরুতেই দু'একটি বিষয়ে আমাদের কয়েকটি ধ্রুপদী কিংবা যুক্তিসম্মত বা রীতিমাফিক ধারণা ও প্রত্যাশার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে এবং সমকালীন বাস্তবতায় সেগুলোর বিশ্লেষণও আমাদের মনোযোগ দাবি করে।
- সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ চাই। এ বিষয়ে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। কিন্তু বিগত প্রায় পাঁচ দশকের মত সময়ের ব্যাপ্তিতে ধ্রুপদী অর্থে 'সুস্থ পরিবেশ' ছিল কি না-তা নিরীক্ষা করার দরকার আছে। এই বিষয়টার বিবিধ তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক মাত্রিকতা আছে। ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলনকে আমরা সঙ্গত কারণেই গৌরবময় বলে উল্লেখ করি। কিন্তু সেই তখনো আমাদের মধ্যে অনেকে ছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু শিক্ষক ছিলেন, যাঁরা ওই আন্দোলনকে শিক্ষার সুস্থ পরিবেশের পরিপন্থী বলে মনে করেছেন।
- এমন সব ঘটনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বর্তমানে শিক্ষার পরিবেশ কলুষিত হওয়া অথবা তার যে ক্রমবর্ধমান অগ্রহণযোগ্য ঝোঁক দেখা যাচ্ছে, তার পক্ষে কোন সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে না। তবে ইতিহাস সত্য এবং নির্মম এবং তার ধারাবাহিক বিচার ছাড়া আমরা সামাজিক প্রবণতাসমূহকে শনাক্ত করতে পারব না। ঠিক হাতে-ছোঁয়া যায় এমন বর্তমানে, বিশ্ববিদ্যালয়ের যে চিত্র আমরা দেখতে পাই, তা কোন অর্থেই সুখকর নয়। কিন্তু মনে করতে পারি, দু'দশক আগেই কিছু সামাজিক ব্যক্তিত্ব, যাঁরা সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত, এমন কথা বলেছেন যে, দেশের ভালোর জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বছর কয়েকের জন্য বন্ধ করে দিলে মঙ্গল হয়। হতাশা ও প্রত্যাশার অপমৃত্যু থেকেই তাঁরা এসব কথা বলেছেন। রেগেমেগেই বলেছেন। দেশ ও সমাজ সম্পর্কে তাদের উৎকণ্ঠা থেকেই বলেছেন।
- এমন কথা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি জন্মায় যে, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ রাখার দায়িত্ব সরকারের। তারাই তো করবে, সুস্থ পরিবেশ না থাকলে তার দায়ভার তাদের নিতে হবে। এসব খুবই যুক্তিসঙ্গত কথা। তার প্রধান কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা প্রশাসনের দায়িত্ব থাকেন, তারা প্রায় সবাই সরকারের প্রীতিভাজন ব্যক্তি, সরকারের প্রণোদনায় বা প্ররোচনায় এইসব প্রতিষ্ঠানের হলের প্রাধ্যক্ষ, প্রক্টর, হাউস-টিউটর প্রভৃতি পদে নিয়োগ পান এবং তারই বাস্তবানুগ প্রতিক্রিয়ায় এমন দায়িত্ববান ব্যক্তিদের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ে সরকার দলীয় ছাত্রসংগঠন নানা অন্যায় ও সহিংস কাজে লিপ্ত হতে পারে। ছাত্রনামধারী বহু নেতা জানে যে, গুরু পাপেও তাদের লঘু শাস্তি দেয়া হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নির্বাহী কর্তা-উপাচার্যদের জন্য এটা এখন অবশ্যমান্য কথা যে, শাসক দলীয় ছাত্রসংগঠনের নেতা-নেত্রীদের চাওয়া-পাওয়া নানাভাবে এমনকি অন্যায়ভাবে হলেও পূরণ করতে হবে। এমন বাস্তবতায় শিক্ষার আদর্শ সুস্থ পরিবেশ থাকা অসম্ভব।
- কিন্তু বাস্তবতার ভিন্নতর পরিপ্রেক্ষিতও আছে। এইমাত্র দিন পাঁচেক আগে প্রশাসনিক আদেশে বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া হল। মোদ্দা কথা অবশ্যই এটা যে, শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখা যাচ্ছিল না। শিক্ষার্থীরা মারামারি করেছে, গাড়ি ভাঙচুর করেছে। না, কোন রাজনৈতিক কারণে নয়, টেণ্ডারবাজির জন্য নয়, গাড়ি চাপায় সহপাঠীর মৃত্যুর জন্য নয়। আমরা একটু বাড়তি অহংবোধের সঙ্গে দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বুয়েটের কথা উল্লেখ করে থাকি। উল্লেখ করতে চাই, কয়েক বছর আগে এখানেই দু'পক্ষের গোলাগুলির মাঝে পড়ে সনি নামে এক ছাত্রী নিহত হয়। কিন্তু এইবার যে এই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হল, তা দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য। বিশ্বকাপ ফুটবলের জন্য। এই দুনিয়া-কাঁপানো খেলাধুলার আসর বসার আগে থেকেই গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল, শিক্ষার্থীদের অনেকেই ২৫ জুন থেকে শুরু হবে বলে নির্ধারিত গ্রীষ্মাবকাশ এক সপ্তাহ এগিয়ে আনতে চেয়েছিল। প্রশাসন তা চাইছিল না, অবশ্যই সঙ্গত কারণে, তাদের একটা একাডেমিক ক্যালেন্ডার আছে। কিন্তু পরিশেষে কী ঘটলো, একাডেমিক ক্যালেন্ডার বাস্তবায়িত হল না, শুধু কিছু অভ্যন্তরীণ দাঙ্গা হল, সম্পদ হানি ঘটলো। প্রশাসন ছুটি এগিয়ে আনলো না, কারণ তারা ঢাকার আকাশের দিকে তাকাননি, তা যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পতাকায় ছেয়ে গেছে। আমার দেশের খবরের কাগজের প্রথম পাতাগুলোও যে দক্ষিণ আফ্রিকার ওই খবরে দখল হয়ে যাচ্ছে, তা তারা দেখলেন না। অবশ্যই তারা শিক্ষার্থীদের দাবি মানেন নি, কিন্তু শিক্ষাক্রম কি চলতে পারল? শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ কি থাকল?

- বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে যে শিক্ষার পরিবেশ নেই তার ভিন্নমাত্রিক সমাজ বাস্তবতাকে আমাদের স্বীকার নিতে হবে। দেশের সব বড় প্রতিষ্ঠান থেকেই আমাদের প্রত্যাশা থাকে। হাসপাতাল, সংসদ বা বিচারব্যবস্থা সব জায়গা থেকেই। তার কোনটাই যে আমাদের প্রত্যাশা মেটাচ্ছে না এবং তার একটা বৃত্তাকার প্রতিফলন আছে, একথা আমাদের মানতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে এই দেশের মধ্যে আলাদা দ্বীপ বলে ভাবলে চলবে না। দেশে যা ঘটে, রাজনীতিতে যা ঘটে, সংসদে যা ঘটে, টেলিভিশনের পর্দায় যা ঘটে তার একটা বড় প্রভাব শিক্ষার্থীদের ওপর পড়বেই। দ্বীপ বানানোর চেষ্টায় চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শহর থেকে অনেক দূরে বানানো হয়েছিল। তাতে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে পথ-যোগাযোগ খাতে কোটি কোটি টাকার পাহাড়প্রমাণ অর্থব্যয় ঘটেছে, শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ তৈরি করা যায় নি।
- ওপরের কথাগুলো স্পষ্টতই হতাশাজনক এবং এমনও মনে হতে পারে, সুস্থ পরিবেশ না থাকার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দায়মুক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে এমন কথা, প্রায় জোর দিয়েই বলা যায় যে, মঙ্গলকর কোনকিছু অদূর ভবিষ্যতে দেখতে পাব এমন আকাশকুসুমে বিশ্বাস রাখা যায় না। বেশ কয়েক বছর আগে, তখন বোধ হয় এরশাদের শাসন আমল, তখন, বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বজনপরিচিত কয়েকজন শিক্ষাবিদ, যাঁরা তার আগে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের পদে (সরকার কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে এবং স্বেচ্ছায়, মানে সরকারের কোন স্বৈরাচারী পীড়াপীড়িতে নয়) আসীন ছিলেন, তাঁদের স্মৃতিচারণ করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে। সময়ের বিচারে তা দু'দশকের বেশি আগেকার কথা। সকল উপাচার্যই হতাশার কথা ব্যক্ত করেছিলেন। এমন বাক্যও অত্যুক্তি হবে না যে, তাদের প্রায় সকলেরই সভাপতিত্বে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের অনেকে যোগ্যতার নিরিখেই নির্বাচিত হয়েছিলেন এমন কথা বলা যাবে না।
- যত সময় গড়াচ্ছে, ওই অসাধু ঐতিহ্যের প্রসার ঘটেছে। এরশাদের পর গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় এমন অসাধুতা প্রায়-অনৈতিক স্বজন-স্বদল-স্বউপদল পোষণে রূপান্তরিত হয়েছে। আমাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে রাজনৈতিক/শাসক দলের হস্তক্ষেপ প্রচ্ছন্নও নয়। সরকার বদল হলে ক্যাবিনেট সেক্রেটারী না বদলালেও উপাচার্য বদল এখন গৃহীত বা স্বীকৃত একটি নীতি। একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্যাক্সে প্রেরিত মন্ত্রণালয়ের আদেশ রাত সাড়ে আটটায় পৌঁছায় এবং কোন অর্থেই যখন অফিসের কর্মসময় নেই, অমন রাতের আঁধারেই নতুন উপাচার্যের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়। আমাদের দেশের একজন মুক্তিযোদ্ধা সামরিক শাসক যখন সরকারপ্রধান ছিলেন, তার সরাসরি নির্দেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট নির্বাচনে টাকার খেলা দেখেছি আমরা। দেখেছি ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশের সুযোগ নিয়ে মূলত কাগজ ব্যবসায়ী কিন্তু আনুষ্ঠানিক পেশায় একজন অখ্যাত কলেজ-শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদের জন্য সিনেট নির্বাচনে লড়েছেন। এভাবে হস্তক্ষেপ করার পদ্ধতি মেনে নিয়েছেন নামী-দামী বৈপ্লবিক শিক্ষক-নেতারা যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্বশাসন বিষয়ে বক্তৃতায় সদাই বক্‌বকম। এতে আর যাই হোক, শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ থাকে না।
- পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ নিজেদের নানা চিহ্নিত বর্ণ-নীল, গোলাপী, সাদা ইত্যাদিতে বিভক্ত করে সাধারণ্যে তাদের আনুগত্য বিষয়ে এক ধরনের কৌতুকের জন্ম দিয়েছেন। সব বর্ণের শিক্ষকদের মধ্যে বহুরূপী আছেন। দেশের শাসকদল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বর্ণও পাল্টায়। এই বিভক্তির শিকড় রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যোগাযোগ-নির্ভর। অতএব, শিক্ষার্থীরাও তাদের শিক্ষকদের অনুরাগ-বিরাগের জায়গাগুলো সহজে শনাক্ত করতে পারেন। তারাও তাদের আনুগত্য অনুযায়ী অধিকারভোগী শিক্ষকদের সঙ্গে মেলামেশা করে এবং সেইভাবে শিক্ষকদের বহুবিধ কৃপালাভে সমর্থ হয়। রাজনীতির বিষয়টা যে মূলত নৈতিক চরিত্রের তা কিন্তু নয়। ফলত, শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে। অশ্রদ্ধা, সুবিধাবাদ ইত্যাদি যে কখনো কখনো শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফলের ওপরও প্রভাব ফেলে, তার সংবাদও মাঝে মাঝেই মেলে।
- বিগত কয়েক বছরে পক্ষ-প্রতিপক্ষ ছাত্র সংগঠনের মধ্যে বিবাদ, সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের ভাষায় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, মারামারি, খুনোখুনির খবরের মাত্রাভেদ লক্ষ করা যায়। সাম্প্রতিককালে সরকারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছাত্রসংগঠনের বিভিন্ন অংশ ও উপাংশের মধ্যে বিরোধ দৃশ্যমানভাবে প্রবলতর হয়ে উঠেছে। এবং নিখাদ সত্যটা এই যে, এই বিবাদ ও রক্তাক্ত পেশী প্রদর্শনীর সঙ্গে শিক্ষার কোন যোগ নেই, এমনকি সাংগঠনিক আদর্শেরও কোন যোগ নেই। শিক্ষার্থীদের বিপুল অংশ

যারা সাধারণ শিক্ষার্থী নামে পরিচিত, তারা হলে বাস করতে সন্ত্রস্ত বোধ করে, কোন নেতাকে যথাবিহিতভাবে সালাম না দেয়ার জন্য এদের মধ্যে কেউ কেউ প্রহৃত হন। এমন পরিস্থিতি যে সুস্থ শিক্ষার অনুকুল নয়, তা বলা বাহুল্য।

- সাম্প্রতিকালে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রীদের ওপর যৌন নিপীড়নের কাহিনী সাধারণ মানুষকে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত করেছে। অনুমান করা যায়, এমন নিপীড়নের ঘটনা যে সংখ্যায় ঘটে, আমাদের সামাজিক কাঠামোর বিচারে, তার অনেকটাই প্রকাশিত হয় না। এক্ষেত্রেও এক ধরনের সাধারণ প্রবণতা দেখা গেছে যে, শাসক দলের মদতপুষ্ট ছাত্রনেতারাই নিজেদের তথাকথিত ক্ষমতার জোরে এমন অপরাধ সংঘটন করে। তাদের প্রবল দাপট। হলের প্রাধ্যক্ষ বা প্রক্টর অধিকাংশ সময় জেনেশুনেই তাদের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করেন। ছাত্রীদের যৌন হয়রানির ক্ষেত্রে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে। রাজনৈতিক আনুগত্যের কারণে ছাত্রীদের উপর এই লাঞ্ছনা, নির্যাতন, সম্ভ্রমহরণ ইত্যাদির প্রতি প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ অনেকসময় নিষ্ক্রিয় থাকেন বা তদন্ত কমিটিও পুনঃতদন্ত কমিটি গঠনের মাধ্যমে কালক্ষেপণ করেন। শুধু তা-ই নয়, আমাদের মনের গভীরে যে পুরুষতান্ত্রিকতার গোঁড়ামি আছে, তার পরিচয়ও অনায়াসে মেলে। অনেক শিক্ষকই এমন নিপীড়নের জন্য ছাত্রীদের চলাফেরা, পোশাক-আশাক ইত্যাদিকে প্রকাশ্যে দায়ী করেন। ছাত্রীদের ওপর শারীরিক নির্যাতনের জন্য সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত অপরাধী প্রাথমিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের প্রশ্রয়ে অপরাধ থেকে মুক্তি পায় এবং পরে নিশ্চয়ই আরো শক্তিশালী কর্তৃপক্ষের সহায়তায় দেশত্যাগ করার সুযোগ পায়। এমন পরিস্থিতিতেও ছাত্রীরা পড়াশোনা চালিয়ে যায়। সুখের কথা এই যে, ছাত্রীরা এখন উত্তরোত্তর প্রতিবাদী হয়ে উঠছে। আর দুঃখ এবং লজ্জার কথা এই যে, এমন অপরাধী হিসেবে এখন কয়েকজন শিক্ষকও চিহ্নিত হয়েছেন, হচ্ছেন।
- বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে সম্পূর্ণত রাজনীতি-নির্ভরতা থেকে সরিয়ে আনতে না পারলে নিকট ভবিষ্যতে শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ বলতে যা বুঝি, তা প্রতিষ্ঠা করা যাবে বলে ভরসা হয় না। এবং তা করার প্রাথমিক শর্ত হল, আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির সংস্কার। পারস্পরিক সহনশীলতা, শ্রদ্ধাবোধ এবং দেশের বৃহত্তর স্বার্থরক্ষায় সহযোগিতার মনোভাব তৈরি না হলে 'বিশ্ববিদ্যালয়'-কে আলাদা করে 'পবিত্র বিদ্যাপীঠ' তৈরি করা যাবে না। যখন সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গেই ভিসি বদলায়, বদলকৃত ভিসি যে বর্তমান শাসকদের সার্বিক অধীনতায় থাকবেন, এমন নিশ্চয়তা পাবার পরই তো তিনি নিয়োগ পান, তখন কি হল দখল বিষয়ে আমাদের নিন্দা করার কিছু থাকে? উপাচার্যবৃন্দের অনেকেই একাডেমিক ক্ষেত্রে খ্যাতিমান, তারা যে কেন নিজেদের ভৃত্যে রূপান্তরে একটা আগ্রহী হন, তা একটি গভীর ও জটিল নৈতিক প্রশ্ন।
- কিন্তু এমন সব নেতির কথা বলার পরও যা বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারণ করা যায় তা হল, এই অসুস্থ পরিবেশেও শিক্ষাদান ও গ্রহণের কার্যক্রমটাও ঘটমান থাকে। যতই আমরা শিক্ষার মান সম্পর্কে প্রশ্ন তুলি, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিই দুর্বল ভিত্তির প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেককেই দক্ষ করে গড়ে তোলে। বারান্দায় ককটেল ফাটলেও ক'মিনিট বিরতির পর আবার শ্রেণীকক্ষে পাঠদান চলতে থাকে। যৌন নিপীড়নের নানা কলঙ্কের পরও ছাত্র-ছাত্রীরা যৌথ অংশগ্রহণে অসাধারণ সব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নির্মাণ করে। এই আলোর দিকটাকে শুধু আরো উজ্জ্বল করে তুলতে হবে।